জন্ম-দ্বিশতবর্ষে ডারউইন এবং বিবর্তনবাদের সেকাল-একাল(পর্যালোচনা)

এস. কুমার

[যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কেবল পণ্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধ না তেকে চিন্তার পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, বস্তু জগতের নিয়মকে তার অপার বিস্ময়ের মাঝ থেকে মূর্ত্ত করে তুলেছে এবং এসবের মধ্যে দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে কূপমন্ডুকতার নাগপাশ ছাড়িছে—চার্লস ডারউইন আবিস্কৃত 'প্রজাতির বিবর্তন' তার মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ ও রচিত গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পিসিস' -এর সার্ধশতবর্ষে এই পর্যালোচনা 'পরিপ্রশ্ন'-র তরফে এই মহান বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা হিসাবে নিবেদন করা হ'ল।

—সম্পাদকমন্ডলী]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসের ব্যক্তরা আমাদের চিন্তায় ও মননে নিতান্ত ব্যক্তি হিসাবে বিরাজ করে এবং তাঁদেরকে কেন্দ্র করে কোনরকম সভায় বা অনুষ্ঠানে তাঁদের মহত্ত্ব, কৃতিত্ব ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আরম এমনভাবে আলোচনা করি যেন মনে হয় তারাই সমকালীন সমাজ-সভ্যতাকে নির্মাণ করেছেন, সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা সেখানে নিছকই একটা গৌণ বিষয়। অথচ বস্তুজগতেই হোক বা মানুষের সমাজেই হোক, কোন ঘটনাই ইতোপূর্বে ঘটে যাওয়া বা ঘটমান বস্তুগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের যে কোন ব্যক্তিই একটি নির্দিষ্ট দেশ-কালের প্রতিনিধি। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনে বা প্রাসঙ্গিকতা তাঁর হাত ধ'রে যে বিষয় বা ঘটনা সমাজকে আলোড়িত করে তা দেশ-কালের সীমানায় আবদ্ধ থাকে না। চার্লস ডারউইন ইতিহাসের এরকমই একজন ব্যক্তি এবং বিবর্তনতত্ত্ব সমাজের এরকমই এক প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়।

সমস্ত বিষয়টাকে যথাসম্ভব স্পর্শ করার জন্য বর্তমান প্রবন্ধকে সাত'টি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনার পরিকল্পনা করেছি।

বিবর্তনবাদের দেশকাল ও তার বিকাশ: সুদীর্ঘকাল বন্য দশা (Wild Phase) কাটাবার পর মানুষ ক্রমশঃ তার অভিযোজন নির্মাণে সাফল্য অর্জন করল। তবে এর ফলশ্রুতিতে মানুষ যে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছিল তা অবশিষ্ট জীবজগৎ থেকে পুরোপুরি পৃথক, অর্থাৎ নজীরহীন। এর ফলশ্রুতিতে মানুষ দুটি নতুন বিষয় অর্জন করতে পেরেছিল। যথা, ভাষা এবং পারস্পরিক সম্পর্কে সংপৃক্ত এক সমাজ। পরবর্তীকালে এই অবস্থা থেকে মানুষ আরও এক নতুন ধরণের দ্বন্দ অনুভব করতে শুরু করল— মানুষের নিজের তৈরী সমাজ ও সামাজিক উৎপাদনের সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব অথবা সংক্ষেপে সমাজের আভ্যন্তরীন। দ্বন্দ্ব। প্রকৃতি -পরিবেশকে কেন্দ্র ক'রে দ্বন্দ্বের সাথে একটা নতুন সংযোজন। উৎপাদন -প্রক্রিয়া বিকাশের মাধ্যমে কখনো কখনো কিছু কিছু দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তগত সমাধানের সুযোগ ছিল না। আসলে এই সব দ্বন্দ্বের সমাধান নির্ভর করে বস্তুজগতের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার বিকাশ সম্পর্কে জানা বোঝার উপর যা কার্যতঃ তৃতীয় সচেতন প্রয়াস বিকাশের পূর্বে সম্ভব ছিল না। যাইহোক, ক্রমশঃ সমাধানহীন এইসব দ্বন্দ্ব রূপান্তরিত হ'ত প্রশ্নে যা সমাজকে ক'রে তুলত অস্থির এবং অনিশ্চিৎ। এই অস্থির এবং অনিশ্চিত অবস্থাকে মেনে নিয়ে বস্তুগত সমাধানের জন্য অপেক্ষা করার উপযোগী মানসিক গঠনও সেই সমাজের ছিল না বা থাকার কথাও নয় কারণ এটারও শর্ত তৃতীয় সচেতন প্রয়াস। অতএব তৎকালীন সমাজে এইসব দ্বন্দ্বের সমাধান শেষ-পর্যন্ত বস্তু নিরপেক্ষ ভাবে ভাবতে বা কল্পনা করতে মানুষ বাধ্য হ'ত। বস্তু নিরপেক্ষ ভাবনা বা কল্পনা রূপ পেত দু'টো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে; যথা—ম্যাজিক ও ধারণা। সমাজে টিকে থাকার জন্য দু'টো প্রক্রিয়ার প্রধান ভিত্তি ছিল বিশ্বাস। ম্যাজিক অবশ্য অনুশীলনের মাধ্যমেও টিকে থাকত। এভাবেই তৎকালীন সমাজ অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা থেকে স্বস্তি পেত।

দ্বিতীয় সচেতন প্রয়াসে যুগে সৃষ্টিতত্ব বা Creationism সমাজোদ্ভুত এরকম এক ধারণা। ধারণাটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই ইতর বিশেষ পরিবর্তন সহ সৃষ্টিতত্ত্বের অস্তিত্ব। ধারণাটা অবশ্যই হঠাৎ ক'রে কারো একান্ত ইচ্ছা উদ্ভুত হয়নি। উপরন্তু, এরকম ধারণার পিছনে যে কোন একটা নির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব ছিল তাও বলা সম্ভব নয়। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক স্থিতিকে কেন্দ্র ক'রে প্রকৃতি -পরিবেশের সাথে মানুষের অসংখ্য দ্বন্দ্ব তৈরী হয়েছিল। ভাষার মাধ্যমে এইসব দ্বন্দ্ব মানুষের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে গিয়ে মানুষ এটা বুঝেছিল যে তার হাতে বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু যে পরিবর্তনগুলি প্রকৃতি - পরিবেশের অনবরত ঘটত বা ঘটে গেছে তাতে মানুষ করেনি। এগুলিও তো বস্তুর পরিবর্তন মাত্র! অতএব এই পরিবর্তন কার হাতে? এই পরিবর্তন যে বস্তুজগতের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের বিকাশ তা তখন মানুষের বোধের জগতে ছিল না। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এই পরিস্থিতিতে এইসব দ্বন্দ্ব তথা প্রশ্নের সমাধানের জন্য মানুষ বাধ্য হয়েছিল অসংখ্য বস্তুনিরপেক্ষ ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে যা একসময় সর্বশক্তিমান একক সত্ত্বা তথা ঈশ্বরের ধারণার পরিণতি লাভ করে এবং সামগ্রিকভাবে সৃষ্টির কাজটি (বস্তুজগৎ ও জীবজগৎ) ঈশ্বরের কাজ হিসাবে কল্পিত হয়।

সৃষ্টিতত্বের উপরোক্ত প্রেক্ষাপট প্রায় সব আদিম সমাজেই সাধারণ ছিল, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি তৈরীতে উপাদানগুলির সাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন সমাজে উপাদানগুলিকে সাজানোর প্রক্রিয়াতে বা পরস্পরের সাথে সংযোগ তৈরীতে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মানবসভ্যতার যে কালপর্বের কথা বলছি সে সময় পৃথিবীতে খুবই অল্প সংখ্যক জনগোষ্ঠী বা সমাজের অস্তিত্ব হচ্ছিল। প্রতিটি সমাজে জনসংখ্যাও ছিল খুব অল্প। এরকম ধারণা নিছক অনুমান নয়, বরং বিবর্তনবাদ দ্বারা সমর্থিত, কোন এক প্রজাতি যখন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন তার দ্বারা জনসংখ্যা খুবই অল্প থাকে। স্থিতিশীল (stable) অভিযোজন নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত একেটি প্রজাতির জনসংখ্যা খুবই নড়বড়ে অবস্থায় থাকে, এককগুলি দীর্ঘায়ু হ'তে পারে না। স্থিতিশীল অভিযোজন নির্মাণের পর দুটি সমস্যাই দূরীভূত হয় এবং প্রজাতির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। মানুষের অভিযোজন বলতে বোঝায় তার সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা যা অবশিষ্ট প্রজাতিসমূহের অভিযোজনের মত স্থিতিশীল হওয়ার পরিবর্তে ক্রম পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা। অতএব এক সময়ে অল্প সংখ্যক মানুষের সমাজে সৃষ্টিতত্ত্বের বিকাশ ঘটার পর পরবর্তীকালে সমাজের সংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়নি। অভিযোজন অনুশীলনের মতই, বিভিন্ন, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের অনুশীলন হোত। এভাবেই সৃষ্টিতত্ত্ব

সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়েছে এবং সুদীর্ঘকাল প্রশ্নাতীত ভাবে টিকে রয়েছে। কখনও কখনও যে কোন কোন সমাজে সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধিতা হয়নি, তা নয়। ইতিহাস খুঁজলে অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন বিরোধিতাই সমাজে-জায়গা করে নিতে পারেনি কারণ বিকল্প হিসেবে বস্তুনিরপেক্ষ ধারণার পরিবর্তে বস্তুগত ধারণার অনুপস্থিতি। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ তৃতীয় সচেতন প্রয়াস বিকশের পূর্ব পর্যন্ত বিবর্তনবাদের পূর্বসূরী হিসেবে সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল প্রশ্নাতীত।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বস্তুজগতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার বিকাশ সম্পর্কে জানা-বোঝা তৃতীয় সচেতন প্রয়াসের অন্যতম শর্ত এবং এই জানা-বোঝাটা শুরু হয়েছিল শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল নতুন মাত্রায় কিছু উৎপাদন কৌশল বিকাশের মধ্য দিয়ে যা একদিকে মানব প্রয়াসের বহুবিবর্ধক (Multiplier of Human Effort) এবং অন্যদিকে ন্যূনতম পরিমাণের পরিবর্তে উৎপাদনের পরিমাণের বহুবিবর্ধনকে (Multiplication) নিশ্চিৎ করেছে। এই প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে এবং তার পরবর্তী বিকাশ ঘটাতে অনিবার্যভাবে বস্তুজগতের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার বিকাশ সম্পর্কিত চর্চার জগতে মানুষকে প্রবেশ করতে হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে জ্ঞানের ভান্ডারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে একসময়ে তৈরী হওয়া বস্তুনিরপেক্ষ ধারণাগুলি বস্তুজগত ধাবণার মুখোমুখি হ'তে শুরু করে। সৃষ্টিতত্ত্বও আড়ালে থাকতে পারেনি, তাকেও ক্রমশঃ বস্তুগত ধারণার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, সৃষ্টিতত্ত্বের বিরুদ্ধে এই বস্তুগত ধারণাগুলি একত্র বিবর্তনতত্ত্ব।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে যেসব দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল, বিবর্তনতত্ত্বর প্রেক্ষাপটও সেই একই দ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন। অতএব দুটি বিষয় পরস্পর পরস্পরের পরিপন্থী হলেও, সামগ্রিকভাবে সমাজ-সভ্যতার উন্মেষ ও তার বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব নয়। সৃষ্টিতত্ত্ব পুরোপুরি বস্তুনিরপেক্ষ ধারণা হওয়া সত্ত্বেও সমাজকে তা সুদীর্ঘকাল অস্থিরতা ও অনিশ্চিৎ অবস্থা থেকে মুক্ত রেখেছে। অতএব বিবর্তনতত্ত্বর সূচনাকাল হিসেবে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী যুগকে চিহ্নিত করার অর্থ দাঁড়ায় সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নসমূহও এই যুগে উদ্ভুত একটি বিষয় যা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুল। অর্থাৎ, অনিবার্যভাবেই সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনতত্ত্ব একই দেশ-কালের সীমানার মধ্যে ভিন্ন সময়ে বেড়ে ওঠা পরস্পর বিরোধী দুটি ধারণা। এখানে দেশ বলতে সামগ্রিকভাবে মানব সভ্যতার অবস্থান এবং কালের ব্যাপ্তি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত তো বটেই, আগমী দিনেও বিস্তৃত হবে।

ডারউইনের দেশকাল : চার্লস রবার্ট ডারউইন ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮০৯, জন্মগ্রহণ করেন ইংল্যান্ডের একটি শহরাঞ্চল স্রপশায়ারের অন্তর্গত স্রুজবারিতে। স্বচ্ছল পরিবার। পিতা এবং পিতামহ উভয়েই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। সেই সুবাদে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল যথেষ্ট অনুকূল। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে স্রুজবারিতে। পরবর্তী পাঠ্যজীবন কেটেছে লন্ডন এবং কেম্ব্রিজে। কেম্ব্রিজে পাঠ্যজীবন শেষ করার পর তিনি H.M.S.Beanle জাহাজে একজন প্রকৃতিবিদ্ হিসেবে পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। ১৮৩৬ সালে ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরবার পর আর কোনদিন তিনি দেশ কোন, লন্ডন শহরের বাইরেও খুব একটা যাননি। তাঁর গবেষণা, লেখালেখি, বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মত বিনিময় প্রয়াত হলন ১৯শে এপ্রিল ১৮৮২ সালে। আক্ষরিক অর্থে এইটুকুই ডারউইনের দেশ-কাল। কিন্তু ডারউইন তাঁর জীবন ভ'রে যে কাজ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আক্ষরিক দেশকালের সীমা অপর্যাপ্ত, অসঙ্গতও বটে। ডারউইনের দেশ-কালের সূচনা হয়েছিল আরও অনেক আগে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। এই দেশ-কালের একটা মোটামুটি স্পষ্ট ছবি না ধরতে পারলে ডারউইন ও তাঁর তত্ত্বের গুরুত্বকে বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সুপ্রাচীন কালে মানুষের সমজে গ'ড়ে ওঠা সৃষ্টিতত্ত্ব ইউরোপীয় সমাজে সংহত রূপ পেয়েছিল ক্রিশ্চান রিলিজিয়নের হাত ধরে। আধুনিক সভ্যতার একেবারে গোড়ার দিকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্ভবত প্রথম পরোক্ষভাবে ধাক্কা খায় কোপার্নিকাস-ব্রুনো-গ্যালিলিওদের হাতে। আজকের সামাজিক অবস্থানের আপেক্ষিকে সূর্যকেন্দ্রিক সৌর পদ্ধতির (Solar System) আবিষ্কারকে খুব ভয়ঙ্করভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বিরোধী মনে না হলেও সে সময়ে এটা ছিল বাস্তবিক বৈপ্লবিক। সৃষ্টিতত্বের অন্তর্গত। ঈশ্বর স্থির করে দিয়েছে পৃথিবীর চারপাশে সবাই ঘরবে। অতএব এর বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ পরোক্ষভাবে সৃষ্টিতত্ত্বকেই বিরোধিতা করা। গ্যালিলিওরা ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন। শাস্তিস্বরূপ ব্রুনোকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, গ্যালিলিওকে সারাজীবন অন্তরালে কাটাতে হয়েছিল। এত অত্যাচার-নিপীড়ন সত্ত্বেও চার্চ ঈশ্বরসৃষ্ট নিয়মকে সুরক্ষিত রাখতে পারেনি। এর প্রধান কারণ সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী ভূ-কেন্দ্রিক সৌর পদ্ধতির ধারণাটি ছিল বাস্তনিরপেক্ষ, পক্ষান্তরে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরপদ্ধতি নিজের আবিষ্কৃত দূরবীন যন্ত্রের মাধ্যমে যা সম্ভব হয়েছিল বস্তুজগতের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব ও তার বিকাশ সম্পর্কিত চর্চার কারণে।

এর পরবর্তীতে নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বর আবিষ্কারটি ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ। মহাকাশে যে কোন বস্তুর চলন, ঘূর্ণন ও অবস্থান ঈশ্বরের নিয়মের অধীন— এই ধারণার মুলে কুঠারঘাত হেনেছিল মহাকর্ষীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মাধ্যমে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে বস্তুর চলন, ঘূর্ণন ও অবস্থান বস্তুর সাথে বস্তুর দ্বন্দ্ব ও তার বিকাশের ফলস্বরূপ। তাৎকাষণিক ভাবে চার্চ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। নিউটন নিজেও বুঝতে পারেননি যে এই আবিষ্কারটি ক'রে তিনি নিজের অজান্তেই ঈশ্বরের কব্জিটা ভেঙে ফেলেছেন।

গ্যালিলিও থেকে ডারউইন— দু'শো বছরেরও অধিক সময়ে ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে সূর্য কেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা ও মহাকর্ষীয় তত্ত্ব ছাড়া তড়িতের চুম্বকীয় ফল, তড়িতচুম্বকীয় আবেশ, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বিভিন্ন ধাতু ও মৌল প্রভৃতির আবিষ্কার ইউরোপীয় সমজের আদলটা দারুণভাবে বদলে দিয়েছে। বলাই বাহুল্য, এসব সম্ভব হয়েছে বস্তুজগতের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার বিকাশ সম্পর্কিত চর্চা - গবেষণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। রিলিজিয়ন এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে এই গতিকে রোধ করা সম্ভব নয় এবং সে নিজেকে টিকিয়ে রাখার স্বার্তে সক্রিয় প্রতিরোধের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সুকৌশলে আপোষের পথ গ্রহণ করতে শুরু করল। সৃষ্টিতত্ত্বের সৃষ্টিটুকু (স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর) অনন্ত হাতছাড়া যাতে না হতে পারে সেদিকে তাকিয়ে রিলিজিয়ন নিত্য নতুন আবিষ্কৃত বস্তুজগতের নিয়ম-নীতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে অভ্যস্ত হ'তে লাগল। অনিবার্যভাবে ইউরোপীয় সমাজের উপর চার্চের এক সময়কার বজ্র কঠিন নিয়ন্ত্রণ আলগা হ'তে শুরু করল।

জীবজগৎ বস্তুজগতেরই একটি পরিবর্তিত অংশ যা ভিন্ন চরিত্রসম্পন্ন এবং সামগ্রিকভাবেই বস্তুজগতের উপর নির্ভরশীল। এই জীবজগৎও বস্তুজগতের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার বিকাশ সম্পর্কিত চর্চা ও গবেষণার পরিমন্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না এবং থাকেওনি। অনিবার্যভাবেই জীবজগৎ এই চর্চা ও গবেষণার পরিমণ্ডলে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে এবং ক্রমশঃ জৈব বিবর্তন তত্ত্বের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্তত দু'টি ঘটনাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতে পারি। প্রথম ঘটনাটির সূত্রপাত ঘটেছে গ্যালিলিওর হাতে। গ্যালিলিও আবিষ্কৃত দূরবীণ যন্ত্রটির উদ্দেশ্য দূরবর্তী বস্তুকে নিকটস্থ করা। এখান থেকে বিপরীত দ্বন্দ্ব তৈরী হওয়া খুব স্বাভাবিক। তা হোল সূক্ষ্মজগৎকে বৃহৎজগতে পরিণত করা। এমন কোন ঐতিহাসিক নথি বা বিবৃতি জানা নেই যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা লিউয়েনহক এই দ্বন্দ্বটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন কিনা; কিন্তু এটা নিশ্চিৎ যে দূরবীন যন্ত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। এর সাহায্যে জীবজগৎ তথা প্রাণ পদার্থের অন্তরমহলে খুব সহজেই ঢোকা সম্ভব হয়েছে। ১৮৩৮ সালে এবং ১৮৩৯ সালে যথাক্রমে স্লেইডেন এবং সোয়ানউদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের পরিচিতি প্রতিষ্টা ক'রে প্রমাণ করেন যে কোষই জীবনের কার্যকরী একক। এই অবিষ্কার সৃষ্টিতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং প্রমাণ করে সমগ্র জীবজগতের একটা সাধারণ উৎস থাকার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে লিনিয়াসের হাতে ১৭৩৫ সালে। তিনি জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতিকে ব্যাপক শ্রেণী বিভাজনের (Taxonomy) মাধ্যমে চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি তৈরী করেন। এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালেও প্রজাতি চিহ্নিতকরণের কাজ চালু থাতে। ফলে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বৈশিষ্টগত সাদৃশ্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'তে থাকে। এর মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৃষ্টিতত্বের পরিপন্থী ধারণা তৈরি হওয়া একটা বাস্তব বিষয়।

সব মিলিয়ে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বস্তজগতের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার বিকাশ সম্পর্কিত চর্চা ও গবেষণা থেকে উদ্ভূত জ্ঞানভান্ডার ইউরোপীয় সমাজে এমন এক সামাজিক পরিমন্ডল তৈরি করেছিল যা সৃষ্টিতত্ত্বের পরিস্থিত ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংল্যান্ডের অনেক প্রাণীবিদ্, উদ্ভিদবিদ্ ও প্রকৃতিবিদ্ এই সময় থেকে তাদের মতামত গবেষণাপত্র, প্রচারপত্র সমালোচনা ও পুস্তক মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকে। এদের অভিমতগুলি ভিভিন্ন রকম তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ হলেও একটি সাধারণ ধারণা উল্লেখযোগ্য। এই ধারণাটি হোল এই যে 'কোন প্রজাতিই পৃথক ভাবে সৃষ্টি হয়নি, প্রতিটি প্রজাতিই তার পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছে। ডারউইন তার 'অরিজিন অব্ স্পিসিস্' গ্রন্থের ভূমিকায় এরকম অনেক ব্যক্তির অভিমত ও তার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে বুঁফো, লামার্ক, এরাসমাস ডারউইন (চাল্স ডারউইনের পিতামহ), গোয়েথ, জিওফ্রয় সেন্ট হিলারী, গ্রান্ট ও প্যাট্রিক ম্যাথিউ -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডারউইনের সমসাময়িক কালে ইংল্যান্ডে তো বটেই, ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশেও অসংখ্য প্রতিতযশা চিন্তাবিদ, ভূ-তত্ত্ববিদ্, প্রাণী ও উদ্ভিদবিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্দের ভীড়। এদের অনেকের সাথে ডারউইন প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, আবার অনেকের সাথে ডারউইনের পরিচয় তাঁদের লেখার মাধ্যমে। চিন্তা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ডারউইনের উপর এঁদের অনেকের প্রভাব ছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেষযোগ্য চার্লস লায়ের, হেনস্ল, থমাস হাক্সলী, বেনথাম হুকার, আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, হোয়েওয়েল হার্শেল ম্যালথাস প্রমুখ।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ডারউইনের ঝোঁক ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল। কেম্ব্রিজে ছাত্রবস্থায় অধ্যাপক হেন্স্লর সাথে তাঁর সম্পর্ক এতটাই গভীর হয়েছিল যে তা একসময় ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল। হেন্স্লর প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতেই ডারউইন বীগল জাহাজে একজন তরুণ প্রকৃতিবিদ হিসেবে বিশ্ব ভ্রমণের সুযোগ পয়েছিলেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ —এই পাঁচ বছর বিভিন্ন দেশও দ্বীপভূমি থেকে বিভিন্ন নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ করে তিনি ইংল্যান্ডে ফেরেন। বীগল জাহাজে ভ্রমণকালীন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরণের জৈব বৈচিত্র্য তাঁর মানসিক জগৎকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এই পর্যবেক্ষণ তাঁর মধ্যে যে টানাপোড়েন তৈরী করেছিল সে সম্পর্কে তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর জীবনীতে লিখেছেন : 'Whilst on board the Beagle I was quite orthodox, and I remember being hearrily laughed at by several of the officers (though themselves orthodox) for quoting the Bible as an unanswerable authority no some point of morality. I suppose it was the novelty of the argument that amused them, but I had gradually come by this time (i.e. 1836 to 1839) to see that the old Testament, from its manifestly false histrory of the world, with the tower of Badel, the rainbow as a sing, &c., &c., and from its attributing to God the feelings of a revengeful tyrant, was no more to be trusted than the sacred books of the Hindoos, or the beliefs of any barbarian, The question that continually rose before my mind and would not be banished, -is it credible that if God were now to make a revelation to the Hindoos, would he permit it to be connected with the belief in Vishnu, Siva &c., as christianity is connected with the Old Testament. This appeared to my utterly incredible...'

প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নির্মাণে বিগল জাহাজে বিশ্বভ্রমণের একটি বড় ভূমিকা আছে ঠিকই, কিন্তু এটাই একমাত্র নয়। আঠারশ তিরিশের দশকে ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানের দর্শনর উপর কাজ করেছেন এমন দুজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন হার্শেল ও হোয়েওয়েল। এই দুজনার দৃষ্টিভঙ্গি ডারউইনকে খুব প্রভাবিত করেছিল, প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রাথমিক ধারণা তিনি পেয়েছিলেন "Breeders' pamphlets" থেকে। ম্যালথাসের লেখা "Principle of population" গ্রন্থটি তাঁকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' বিষয়টি ভাবতে উৎসাহিত করেছিল।

১৮৪২-৪৪ -এর মধ্যেই ডারউইন তাঁর মূল তত্ত্বটিকে দেখেন। একসময় তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চার্লস লায়েল এবং বেনথাম্ হুকার। হায়েল এবং হুকার স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছিলেন বিখ্যাত পন্ডিত। এঁদের পরামর্শে তিনি ১৮৫৬ সালে 'অরিজিন অফ স্পিসিস' রচনায় হাত দেন।

প্রায় একই সময়ে ইংল্যান্ডের আর একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ১৮৫৮ -এর কোন এক সময়ে ওয়ালেস On The Tendency Of Varieties To Depart Indefinitely Form The Original Type' শীর্ষ একটি প্রবন্ধ ডারউইনের কাছে পাঠান। ডারউইন ওয়ালেসকে আগে থেকে চিনতেন না। তিনি প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে পরিষ্কার উপলব্ধি করেন যে ওয়ালেসও তার মত

'প্রাকৃতিক নির্বাচনের' সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি গবেষণাপত্রটি চার্লস ও হুকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। চার্লস এবং হুকারের প্রচেষ্টায় ডারউইন এবং ওয়ালেস — উভয়ের গবেষণা পত্র লিনিয়ান সোসাইটিতে নথিভুক্ত হয়।

'অরিজিন অব্ স্পিসিস' প্রথম প্রকাশিত হয় ২৪শে নভেম্বর, ১৮৫৯ এবং সেই দিনই প্রথম প্রকাশনার ১২৫০ কপি বই বিক্রী হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণের কপি প্রকাশিত হয়েছিল ৭ই জানুয়ারি ১৮৬০। ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত শুধু ইংল্যান্ডেই বইটির ১৬০০০ কপি বিক্রী হয়েছিল। সে সময় অর্থাৎ ১৮৫৯-১৮৬০ এ খেলার মাঠ থেকে হেঁসেল ঘর— সর্বত্র আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছিল অরিজিন অফ্ স্পিসিস। পুরোন সৃষ্টিতত্ত্বের সামনে এত বই যতি চিহ্ন পরে যাওয়াতে চার্চ যথেষ্ট সংকটে। গ্যালিলিওর মত ডারউইনকে সবক শেখানো সম্ভ নয়। তবুও তো বসে থাকা যায় না ইংল্যান্ডের আর্চবিশপ 'স্যামুয়েল উইলবার ফোর্সের উদ্যোগে অক্সফোর্ডের বৃটিশ এ্যাসোসিয়েশনে ১৮৬০ এ ডারউইন তত্ত্ব নিয়ে এক সভায় আয়োজন করা হয়। ইউলবারফোর্স তৎকালীন একজন উদ্ভিববিত রিচার্ড ওয়েনের (ডারউনের বিরোধী) সহযোগিতায় কিছু কু-যুক্তি সাজিয়ে সভায় উপস্থিত হলেন এবং আধঘন্টা ধরে এক শূন্যগর্ভ রাখলেন। বক্তৃতার শেষে উপস্থিত হাক্সলীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানতে চাইলেন — "was it through his grand father or grandmother that he claimed his discent from monkey?" এরপর ছিল হাক্সলীর পালা। তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে জবাব দিলেন, "I am not ashamed to have a monkey for my ancestor; but I would be asharmed to be connected with a man who used great gifts to obscure the truth." হাক্সলী ডারউইনের তত্ত্বের পক্ষে আমৃত্যু সওয়াল করে গেছেন।

অতএব ডারউইনের দেশকাল শুধু স্রুজবারি এবং ১৮০৯ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার দেশ সমগ্র ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কালের শুরু শিল্প বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব থেকে। সৃষ্টিতত্ত্বের পরিপন্থী বিবর্তনতত্ত্বের স্বপক্ষে চার্লস রবার্ট ডারইউন এই দেশ-কালের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি।

ডারউইনের অবদান : ডারইউনের অবদান জৈব বিবর্তনকে কেন্দ্র ক'রে। এ সম্পর্কে আলোচনার পূবর্বে জৈববিবর্তনের পরিধি সম্পর্কে একটা সাধারণ রূপরেখা জানা প্রয়োজন। জৈব বিবর্তনের পরিধিতে দু'টি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে— যথা প্রজাতির উদ্ভব (speciation) এবং (Adaptation)। যদিও অভিযোজন প্রজাতির উদ্ভবের পরবর্তীতে প্রাসঙ্গিক হয়, তথাপি প্রজাতি অভিযোজনে ব্যর্থ হলে প্রজাতির উদ্ভব গুরুত্বহীন হ'য়ে পড়ে। অর্থাৎ দুটি বিষয়ই জৈববিবর্তনের পরিধিতে সমমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ।

লিনিয়ান সোসাইটিতে নথিভুক্ত ডারউইনের গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল— "On form charles Darwin to Professor Asa Gray of Boston, U.S.A., Dated Down, 5 septembar 1857.

এত বড় শিরোনাম হলেও গবেষণাপত্র দুটিতে ডারউইনের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ও গোছানো ছিল না। পক্ষান্তরে রাসেলের গবেষণাপত্রটি (পুর্বেই শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে) খুবই স্পষ্ট ও গোছানো ছিল। কিন্তু রাসেল তাঁর গবেষণাপত্রকে বিস্তৃত ক'রে ডারউইনের মত কোন গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করতে পারেননি। বস্তুত : ডারউইনের 'অরিজিন অফ্ স্পিসিস' এত বিস্তৃত তথ্যসমভাবের পরিপূর্ণ এবং যৌক্তিক ভাষার বাধুনিতে তৈরী যে সমকালীন পাঠক সমাজের কাছে খুব দ্রুত ডারউইনের পৌঁছাতে অসুবিধা হয়নি। সম্ভবত : এজন্য ডারউইন রাসেলকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছিলেন। অবশ্য ডারউইনের প্রতি লন্ডন শহরের পন্ডিত কূলের আনুকূল্যও ছিল ডারউইনের পক্ষে একটি অতিরিক্ত সুযোগ।

যাইহোক্, ডারউইন এবং রাসেলের গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাকৃতিক নির্বাচন। ডারউইন তাঁর অরিজিন অব্ স্পিসিস' বিশদভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। হঠাৎ ক'রে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন" — এই শব্দদ্বয়কে শুনলে মনে হয় প্রকৃতি বোধহয় মানুষেরই মত এক সচেতন সত্ত্বা এবং বেশ বুঝে - শুনে একটি জীব - প্রজাতিকে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার জন্য নির্বাচিত করে। না, ডারউইন সেভাবে বিষয়টিকে দেখেননি। একটি প্রজাতি তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম ক'রে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করে। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার জন্য একটি শক্তির (Force) প্রয়োজন। এই শক্তিটা এখানে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। ডারউইন এই শক্তির ধারণাটা পেয়েছিলেন ম্যালথাসের থেকে। একটি প্রজাতি তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে তার অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে। সংগ্রামে টিকে থাকার ছাড়পত্র পাওয়ার অর্থ তার অর্জিত বৈশিষ্ট্য লাভজনক (Favourable)। যখন কোন অর্জিত বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকর হয় তখন তা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ডারউইন এই ব্যাখ্যার উপর দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে নিম্নোক্ত উপায় সংজ্ঞায়িত করেছেন: "...preservation of ravourable variations and the rejection of injurious variation, I call natural Selection. variations neiher useful nor injurious woutd not be affected by natural selection..."

একটি প্রজাতির উদ্ভব যে অন্য কোন পূর্ব প্রজাতি থেকে এবং তা ঘটে থাকে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনীয়তার (variation) জন্য— এটা ডারউইন নিশ্চিৎ করেছেন। এই পরিবর্তনীয়তার কারণ হিসেবে ডারউইন সংক্ষেপে যা বলেছেন তা নিম্নরূপ :

"On the whole, I think we may conclude that habit, use and disuse, have, in some cases, played a considerable part in the modification of the constitution, and of the strucature of various organs; but that the effects or use and disuse have ofter been largely combined with, and sometimes overmasteredly, the natural selection of innate differences."

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে ডারউইন জৈব বিবর্তনের দু'টি বিষয়কেই ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে অভিযোজন। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম মানে অভিযোজন নির্মান প্রক্রিয়া এবং সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে টিকে যাওয়া মানে অভিযোজন নির্মাণে সফল হওয়া। প্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কে তিনি যতটুকু ভাবার চেষ্টা করেছেন তা প্রধানত : 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'কে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাসঙ্গিক, বিষয়টা শক্ত ভিতের উপর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ডারইউনের সীমাবদ্ধতা : একজন ব্যক্তি মানুষের সীমাবদ্ধতা মূলত : তার দেশ-কালের আপেক্ষিক এবং কোন একটি বিশেষ বিষয়ে দেশ-কালের

সীমাবদ্ধতা কতটা তা সেই দেশ-কালের প্রতিনিধির চোখে অনেক সময় ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে অনেক কাল পরে অন্য মানুষের চোখে। এজন্য কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ-কালে কোন একজন ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে যতটুকু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয় তা তার কাছে মনে হয় নিজস্ব ব্যর্থতা এবং সে যেন তেন প্রকারেণ সেই ব্যর্থতা অতিক্রম করার চেষ্টা করে। ফলস্বরূপ ব্যক্তির মধ্যে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ডারউইনের মধ্যে এই প্রবণতা কমবেশী ছিল। তিনি সব কিছুকেই 'প্রাকৃতিক নিবাচন' তত্ত্ব দিয়ে ব্যখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

ডারউইনের সমসাময়িককালে বা একটু আগে বিবর্তন প্রসঙ্গে বুঁফো ও লামার্ক বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। বুঁফো সম্পর্কে ডারউইনের অভিমত ছিল এই যে একটি প্রজাতি থেকে আর এটি প্রজাতির উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে বুঁফো নীরব ছিলেন। লামার্কের বক্তব্যের কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল —ব্যবহার (Use), অব্যবহার (Disuse) এর অভ্যাস (Habit) পরিবর্তনীয়তা কারণ এবং অর্জিত পরিবর্তনীয়তা উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায়'। লামার্কের বক্তব্যের কঠোর সমালোচক ছিলেন চার্লস লায়েল। ডারইউন তাঁর গ্রন্থে লামার্কের বক্তব্য খুব গুরুত্বসহকারে উল্লেখ না ক'রে তিনিও ব্যবহার, অব্যবহার ও অভ্যাসকে পরিবর্তনীয়তার কারণ হিসেবে দেখেছেন।

'অরিজিন অব্ স্পিসিসের' ষষ্ঠ অধ্যায়ে ডারইউন নিজেই চারটি প্রশ্ন তুলেছেন। তার মধ্যে প্রথম তিনটি খুবই প্রাসিঙ্গক। প্রশ্ন তিনটি তাঁর নিজের ভাষাতেই রাখছি:

i) Why, if species have descended from other species by insensibly fine gradations, do we not every where see innumberable transtitional forms? Why is not all nature in confusion instead or species being, as we see them, well defined ?

ii) Is it possible that an animal having, for instance, the structure and habits of a bat, could have been formed by the modification of some animal with wholly different habits? can we believe that natural selection could produce. on the one hand, organs of trifling importance and, on the other hand, organs of such wonderful structure, as the eye, of which we hardly as yet fully understand the inimitable perfeciton?

iii) Can instincts be acquired and modified througn natural selection?

প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডারউইন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে অসংখ্য অন্তবর্তীকালীন প্রজাতির অস্তিত্বকে থাকতেই হবে। যদি কোথাও না পাওয়া যায় তাহলে তার জন্য দায়ী Imperfection of geological record বা ভূ-তাত্ত্বিক অবশেষের অসম্পূর্ণতা। এই ব্যাখ্যা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন অন্যত্র। প্রথম প্রশ্নটাই একটা মৌলিক প্রশ্নকে উস্কে দিয়েছে। একটি প্রজাতি থেকে অর একটি বা একাধিখ প্রজাতির উদ্ভবের বস্তুগত ভিত্তিটা (Material Basis) কী? কোন প্রজাতির কোন একটি সদস্য জন্ম সূত্রে কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে সেই বৈশিষ্ট্যটি মাতা-পিতা থেকে কার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে আসে এবং যার মাধ্যমে পরিবাহিত হয় তার মধ্যে কী পরিবর্তন ঘটে ও কেন ঘটে? এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর একত্র করলে দাঁড়ায় প্রজাতির উদ্ভবের বস্তগত ভিত্তি। বলা বাহুল্য, ডারউইনের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন বা তার উত্তর — কোনটাই পাওয়া সম্ভব ছিল না কারণ এটা ছিল দেশ-কালের সীমাবদ্ধতা।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে তিনি অসংখ্য উদাহরণ সহযোগে আলোচনা বিস্তৃত করেছেন, কিন্তু পরিষ্কার কোন উত্তর বা সমাধান অধরা থেকে গেছে। এটাই স্বাভাবিক। আসলে এই প্রশ্নের সমাধানও নিহিত রয়েছে প্রজাতির উদ্ভবের বস্তুগত ভিত্তির মধ্যে। এটাও একই ভাবে দেশ-কালের সীমাবদ্ধতা

তৃতীয় প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাকে Instinct বা সহজাত বৈশিষ্ট্য বলা হবে এ নিয়ে ডারউইন নিজেও দোদুল্যমান ছিলেন। তাঁর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল আলোচ্য বিষয়গুলিকে সংজ্ঞায়িত করা, কিন্তু Instinct এর কোন সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা তিনি করেননি। সপ্তম অধ্যায়ে Instinct নিয়ে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন, উপস্থাপন করেছেন অসংখ্য উদাহরণ ও পর্যবেক্ষণ। কিন্তু সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কোন নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াতে পারেননি। সপ্তম অধ্যায়ের এক জায়গায় তিনি বলেছেন : "If we suppose any habitual action to become inherited - and I think it ca n be shown that this does sometimes happen - then the resemblance between what originally was a habit and an instinct becomes so close as not to be distinguished."

এরকম একটি সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য পরিবেশনের পরমূহুর্তেই তিনি বলেছেন :

"No complex instinct can possibly be produced through nutural selection, except by the slow and gradul acumulation of numerous, slight, yet profitable, variations."

বস্তুত : Instinct -কে সংজ্ঞায়িত না করতে পারার জন্য ডারইউনের মধ্যে সংশয়টা আরও গভীরভাবে তৈরী হয়েছিল। সমস্যাটা এখনও বিদ্যমান। প্রজাতির উদ্ভবের মত অভিযোজনেরও বস্তুগত ভিত্তি রয়েছে। অভিযোজন যেরকমই হোক্ না কেন, প্রজাতিকে তা নির্মাণ করতে হয়। এটা তার অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রয়োজন। অভিযোজনের বস্তুগত ভিত্তির বিশ্লেষণের মাধ্যমেই Instinct সম্পর্কে যৌক্তিক বোঝাপড়া তৈরী করা সম্ভব।

ডারইউনের এইসব সীমাবদ্ধতাগুলি আসলে ছিল দেশ-কালের সীমাবদ্ধতা। গবেষণা ও চর্চার মধ্য দিয়ে জীববিদ্যা তখন সদ্য আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করলেও তার সামনে প্রধান প্রতিবন্ধকাতা ছিল সৃষ্টিতত্ত্ব। ডারউইন এই ক্রান্তিকালকে শক্ত হাতেই শাসন করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে জীববিদ্যার চর্চা ও গবেষণা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ডারউইনের সীমাবদ্ধতাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এই চর্চা ও গবেষণায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

বিবর্তনবাদের একাল : খুব সতর্কতার সাথেই বলতে চাই, বিবর্তনবাদের একাল শুরু হয়েছে দ্য ভ্রাইস-এর হাত ধরে বিংশতি শতাব্দির একেবারে শুরুতে। দ্য ভ্রাইস প্রায় একই সঙ্গে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, একটি মেন্ডেলের বংশগতি সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ ফলকে পুনরাবিষ্কার করা এবং দ্বিতীয়টি জিন মিউটেশন। সম্ভবত তিনি খুব ভালভাবেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে জৈব বিবর্তন, বিশেষ করে প্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কে ভাল বোঝাপড়া তৈরি করতে হলে জেনেটিক্সের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তিনি দু'টোরই মেলবন্ধন করেছিলেন। এরপর থেকে

জেনটিক্সের গবেষণা দ্রুত এগিয়েছে। পাশাপাশি মেলবন্ধন করেছিলেন। এরপর থেকে জেনেটিক্সের গবেষণা দ্রুত এগিয়েছে। পাশাপাশি এগিয়েছে মালিকিউলার বায়োলজির গবেষণা। DNA-RNA -এর গঠন প্রণালী, জেনেটিক কোড, DNA-RNA -এর সংশ্লেষণ, প্রোটিন সংশ্লেণ DNA-RNA -এর ভূমিকা প্রভৃতি সহ জীব কোষের হাঁড়ির খবর আজ অনেকটাই আমাদের জানা হয়ে গেছে। এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে নিউক্লিয়সের অভ্যন্তরস্থ ক্রোমোজোমের একক জিন বা DNA -এর জীবদেহের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যর সংকেত প্রোটিন লিপির (Genetic code) মাধ্যমে সংরক্ষণ করে এবং তাকে এক জনুক্রম থেকে আর এক জনক্রমে পরিবহন করে। DNA -এর কোড বা প্রোটিনলিপি নির্ভর করে DNA এর ক্ষার সজ্জার উপর। খার সজ্জার কোনরকম পরিবর্তন ঘটলেই প্রোটিনলিপি বদলে যাবে এবং প্রোটিনলিপি বদলে গেলেই জীবদেহের বৈশিষ্ট্য বদলে যাবে। এটাই প্রজাতির উদ্ভবের (Speciation) প্রাথমিক বস্তুগত ভিত্তি। কিন্তু কেন ক্ষারসজ্জার বদল ঘটে? কোন রকম শক্তির উপস্থিতি ছাড়া কোন পরিবর্তনই ঘটতে পারে না। তবে DNA -এর খারসজ্জার পরিবর্তনে কী ধরণের শরিত প্রয়োজন? এ কাজটাও হেরম্যান মুলার ১৯২৭ সালে হাতে কলমে করে দেখিয়েছেন যে শক্তিটাকে হতে হবে X মত অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য। বিশিষ্ট। অতএব বস্তগত ভিত্তিটা কেমন হতে পারে তা একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু বিগত চারশ কোটি বছর ধরে জড় থেকে প্রাণ-পদার্থ, প্রাণ-পদার্থ থেকে প্রথম জীব প্রজাতি (সমূহ) এবং প্রথম জীব প্রজাতি (সমূহ) থেকে আজ পর্যন্ত জীবজগতের বৈচিত্র্য, বিস্তৃতি ও বিকাশের পথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্রান্তিকালে বস্তুগত ভিত্তি কীরকম ছিল এবং তা কীভাবে কার্যকরী হয়েছে সে বিষয়ে জানার এখনও অনেক কিছু বাকী। ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। বিভিন্ন প্রজাতির শারিরীক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কার্যকালাপ সম্পর্কে বহু তথ্য গত দেড়শ বছরে আমরা জেনেছি। এইসব তথ্য থেকে অভিযোজনের বস্তুগত ভিত্তিও এখন অনেক স্পষ্ট। আগামী দিনে আরও স্পষ্ট হবে।

ডারউইনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব : ১৭৩৫ থেকে ১৮৫৮ —এই ১২৪ বছরের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে এক ঝাঁক মানুষ সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন, বিরোধিতা করেছেন ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিটি প্রজাতিকে পৃথকভাবে সৃষ্টিকরার ধর্মীয় ধারণাকে। এঁদের মধ্যে অনেকের বিরোধিতা, বিশেষভাবে লামার্ক, বুঁফো ও গোয়েথের বিরোধিতা তথা গবেষণা সেই সময়ের আপেক্ষিককে ডারউইনের থেকে খুব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ওয়ালেস তো ডারইউনের আক্ষরিক অর্থেই সমসাময়িক এবং উভয়ের গবেষণার সিদ্ধান্ত একইরকম। এর একটি বড় কারণ ডারউইন তাঁর কাজকে শুধুই গবেষণা পত্রের মধ্যে আটকে রাখেন নি। পন্ডিত সমাজ ছাড়িয়ে একেবারে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং পরিশ্রমও করেছিলেন। ১৮৪২ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত তিনি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব' -এর প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। এরপর ১৮৫৬ সালে তিনি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ (অরিজিন অব স্পিসিস) রচনায় মনোনিবেশ করেন। অসংখ্য প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং তত্ত্বে ঠাসা এরকম একটি গ্রন্থ সেই যুগে মাত্র ১৮ বছরের মধ্যে শুধু ইংরেজী ভাষী ১৬০০০ পাঠকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের পরিপন্থী বিবর্তনতত্ত্বও বৃহত্তর সমাজে আশ্রয় তৈরী করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে যে সামাজিক চাপ তৈরী হয়েছিল তা জীববিদ্যার গবেষণাকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। বিগত একশ বছরে জীববিদ্যার গবেষণার ফলে বিভিন্ন শাখার উন্মেষ ঘটেছে এবং তাদের বিকাশও ঘটেছে। এই ঘটনাকে পূর্বোক্ত সামাজিক চাপ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না।

পূর্বোক্ত সামাজিক চাপের দরুণ বেশ কিছু নতুন বিষয়েরও অবতারণা ঘটেছে। এদের মধ্যে অন্তত: 'প্রাণের উৎস' সম্পর্কিত গবেষণা বিশেষকরে উল্লেখের দাবী রাখে। প্রজাতির উদ্ভবের মধ্যেই এই ইঙ্গিত নিহিত। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রজাতি থেকে প্রজাতির উদ্ভব ঘটলে সূচনাকারী প্রজাতি সম্পর্কে প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী। সূচনাকারী প্রজাতি, তা যত সরল প্রকৃতিরই হোক না কেন, তার উদ্ভবের জন্য অবশ্যই কোন প্রজাতিকে সে পায়নি; পেয়েছে জল, পাথর, বায়বীয় গ্যাস ও আলোক। কীভাবে এই রসকষহীন বস্তুগুলি মিলেমিশে এককার হয়ে প্রাণের ফল্গুধারা তৈরী করেছিল সে ইতিহাসও আজ আর আপাদমস্তক অধরা নয়।

উপসংহার : বিবর্তন সম্পর্কিত ডারইউনের মতবাদ অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্ব সমাজ-সভ্যতার উপর বিভিন্ন ভাবে প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মূল ভিত্তিটাই সৃষ্টিতত্ত্ব', অতএব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির পুরোধাবর্গ (যাজক, পাদ্রী, মৌলবী ও পুরোহিত ইত্যাদি) বিবর্তনবাদকে বিরোধিতা করবে— এটা স্বাভাবিক। বিরোধিতাটা ডারউনের সময় থেকেই ছিল, এখনও অব্যাহত। বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-প্রশাসন নিজেও এই বিরোধিতায় সামিল, বিশেষ করে যে সব রাষ্ট্র ধর্মীয় সংবিধান দ্বারা পরিচালিত। অবশ্য গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিও খুব বেশী ব্যতিক্রম নয়। এর কারণ, নতুনভাবে বা পরিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান তৈরী হলেও যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি, তারা এখনও গতানুগতিকতার (Traditionality) অনুসরণকারী। অতএব বিবর্তনতত্ত্ব এখনও নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের মত সার্বজনীন নয় ১৯৮১ তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রদেশ আরকানসাস্ ডারউইন - তত্ত্বের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বর বাধ্যতামূলক পঠন-পাঠনের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। হে আইনের বিরুদ্ধে আমেরিকান সিভিল লিবারটিজম ইউনিয়ন কোর্টের দারস্থ হয় এবং পরবর্তীকালে কোর্টের আদেশে আইনটি বাতিল হয়। একই ভাবে ১৯৮২ সালে (ডারইউনের মৃত্যু শতবর্ষে) ইউনাইটেড আরব এমিরেটাসে আইন করে ডারউইন তত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ পড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়।

রিলিজিয়নের পুরোধারা তথা বিবর্তন বিরোধীরা অনেক সময় ডারউইনতত্ত্বকে পুঁজিবাদের বৈধতা দাতা হিসেবে সমালোচনা করে, যদিও পুঁজিবাদ ও রিলিজিয়ন একটা মিথোজিবিতার(Symbosis) সম্পর্কে আবদ্ধ এবং পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। একথা টিকই যে পুঁজিবাদীরা তাদের কৃতকর্মকে (শোষণ, মুনাফা অর্জন, যুদ্ধ প্রভৃতি) নীতিনিষ্ঠ ও বৈধ দাবী করার লক্ষে ডারউইন প্রস্তাবিত 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' এবং যোগ্যতমর উদ্বর্তন'কে 'বৈজ্ঞানিক' যুক্তি হিসেবে দাঁড় করায়। এরকম যুক্তি প্রদর্শনের কারণ হয় অজ্ঞতা, নয়তো ভন্ডামী। প্রথমত : ডারউইন-তত্ত্বকে দার্শনিক ভিত্তি ধরে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি এবং ডারইউনতত্ত্বের অস্তিত্ব থাকা বা না থাকার উপর পুঁজির অস্তিত্বও

বিকাশ নির্ভর করে না। দ্বিতীয়ত: পুঁজিবাদ ডারউইন তত্ত্ব থেকে 'প্রতিযোগিতা' শব্দটিকে চয়ন করে যেভাবে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটিয়েছে তার সাথে ডারউইন তত্ত্বের কোন মিল নেই। ডারউইন তত্ত্বের প্রতিযোগিতা শব্দটি প্রজাতির অভিযোজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থাৎ প্রথম সচেতন প্রয়াসের ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং অবশিষ্ট বৃহদ্ অংশকে নিকৃষ্টে পরিণত করা। এই প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় হচেতন প্রয়াসের অধীন যা একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের মত ব্যক্তিত্ব সেই যুগেই বিষয়টিকে সম্যক অনুধাবন করেছিলেন: "The struggle for existence. above all this must be strictly limited to the struggles resulting from plant and animal over-population, which do in fact occur at certain staes of plant and lower animal life" (সূত্র-Dialestics of Nature)

সূত্র

Charles Darwin - The Origin of Species
Charles Darwin - Autobiography of Charles Darwin
Frederick Engels - Dialectics of Nature.
F. Burkhardt & s. Smith - The Correspondance of Charles Darwin (Edited)
A.C. Seward - Darwin and Modern Science (Edited)
Ruse Mechael - The Darwinian Paradigm
Davidsion Wilson - Darwin's Cathedral
Somit Albert - Darwinism, Dominance and Democracy
Headly Frederick - Darwinism and Modern Socialism
S.A. Barnett - A Century of Darwin
G.S. Carter - A Hundre years of Evolution
পরিপ্রশ্ন, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ — 'প্রাণের প্রকাশ ও পরবর্তী জৈব বিবর্তনে আয়নীকারক বিকিরণ'
পরিপ্রশ্ন, জানুয়ারী ২০০৮— 'সচেতন প্রয়াস ও মস্তিষ্ক — একটি প্রশ্ন'
পরিপ্রশ্ন, জুন ২০০৮ — 'চতেন প্রয়াসের উৎস ও তার বিকাশ'
পরিপ্রশ্ন, নভেম্বর ২০০৮ — 'সামাজিক উৎপাদনের সূচনা ও বিকাশ— জৈব বিবর্তনের ধারাবাহিকতা'